তিন বন্ধু সিরিজের ৩য় বই

কিশোরদের জন্য রহস্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

হারিয়ে যাওয়া নদীর মানচিত্র

একটি পুরোনা মানচিত্র, শুকিয়ে যাওত্রা নদী
আর বহু বছরের একটি
অমীমাংসিত রহস্য...

তিন বন্ধুর নতুন অভিযান

ক্যাটালগ
পাবলিকেশনস

ক্যাটালগ
পাবলিকেশনস
www.catalog.com.bd

অধ্যায় ১

মানচিত্রের ভাঁজে

বর্ষার ছুটি তখন প্রায় শেষের দিকে। রাফি, নীলয় আর তূর্য তিনজনই “আকাশবাড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রে” বসে পুরোনো জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল। দ্বিতীয় রহস্যের পর বিজ্ঞানকেন্দ্রের পুরোনো যন্ত্রপাতি নিয়ে তাদের আগ্রহ আরও বেড়ে গিয়েছিল।

সেদিন বিজ্ঞানকেন্দ্রে নতুন কিছু বই ও পুরোনো নথি এসেছিল। নথিগুলো একসময় পাশের এলাকার একটি পুরোনো বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবে ব্যবহার করা হতো। তূর্য একটা বড় কাঠের বাক্স খুলে বলল, “এখানে তো মনে হচ্ছে গুপ্তধন আছে!” নীলয় হেসে বলল, “তোর কাছে সব পুরোনো জিনিসই গুপ্তধন।” “কারণ গুপ্তধনও তো পুরোনো হয়!”

রাফি বাক্সের ভেতর থেকে একটা মোটা খাতা বের করল। খাতার পাতাগুলো হলদেটে হয়ে গেছে। প্রথম কয়েকটি পাতা ছিল নদী, খাল আর গ্রামের রাস্তার আঁকা ছবি দিয়ে ভরা। হঠাৎ একটি ভাঁজ করা কাগজ মাটিতে পড়ে গেল। রাফি কাগজটি তুলে সাবধানে খুলল। সেটি ছিল একটি হাতের আঁকা মানচিত্র। মানচিত্রে একটি নদী

আঁকা হয়েছে। নদীটি পাহাড়ের দিক থেকে নেমে এসে কয়েকটি গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ একটি জায়গায় নদীর রেখা থেমে গেছে। নদীর পাশে ছোট করে লেখা— “এখানে নদী হারিয়ে যায়।”

তূর্য চোখ বড় বড় করে বলল, “নদী আবার হারায় কীভাবে?” নীলয় মানচিত্রটা ভালো করে দেখল। “হয়তো নদী মাটির নিচে চলে গেছে।” রাফি মাথা নাড়ল। “হতে পারে। কিন্তু এই মানচিত্রটা কত পুরোনো, সেটা আগে জানতে হবে।” মানচিত্রের নিচের কোণে একটি তারিখ লেখা ছিল। ১৯৭৮। আর তার নিচে আরও একটি বাক্য — “যে নদীকে সবাই মৃত ভাবে, তার শব্দ এখনও শোনা যায়।” তিন বন্ধু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তূর্য ধীরে ধীরে বলল, “এটা তো আগের গল্পের থেকেও বেশি রহস্যময়।” রাফি মানচিত্রটা ভাঁজ করে বলল, “তাহলে শুরু করা যাক।”

অধ্যায় ২

মৃত নদী

পরদিন তিন বন্ধু মানচিত্রের জায়গাটি খুঁজে বের করতে বের হলো। মানচিত্রে নদীর পাশে কয়েকটি গ্রামের নাম ছিল। বর্তমান মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে তারা বুঝল, জায়গাটি বিজ্ঞানকেন্দ্র থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। সামিউল স্যার তাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তবে একটা শর্ত দিলেন— “কোনো বিপজ্জনক জায়গায় যাবে না। আর যা দেখবে, তার ছবি ও নোট রাখবে।”

তূর্য বলল, “স্যার, আমরা এবার কোনো অনুমান আগে থেকে করব না।” স্যার হেসে বললেন, “এই কথাটাই শুনতে চেয়েছিলাম।” দুপুরের দিকে তারা গ্রামটিতে পৌঁছাল। মানচিত্রে আঁকা নদীর জায়গায় গিয়ে তারা অবাক হয়ে গেল। সেখানে কোনো নদী নেই। আছে একটি বিশাল নিচু জমি। জায়গায় জায়গায় ঘাস, কাশবন আর ছোট ছোট গর্ত।

একজন বৃদ্ধ কৃষক তাদের দেখে এগিয়ে এলেন। রাফি মানচিত্রটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, “চাচা, এখানে আগে কি নদী ছিল?” বৃদ্ধ কিছুক্ষণ মানচিত্রের দিকে

তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, “ছিল বাবা। অনেক বছর আগে।” তূর্য সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, “নদী গেল কোথায়?” বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেন, “মানুষ নদীকে মারে, নদী নিজে মরে না।” নীলয় অবাক হয়ে বলল, “কীভাবে?” বৃদ্ধ হাত দিয়ে দূরের জমির দিকে দেখালেন। “আগে বর্ষায় এই জায়গা পানিতে ভরে যেত। এখন পানি আসে না। তবে খুব ভারী বৃষ্টি হলে মাঝে মাঝে মাটির নিচ থেকে পানি উঠে আসে।” রাফি নোটবুকে লিখল। “মাটির নিচ থেকে পানি উঠে আসে।” তারপর সে জিজ্ঞেস করল, “নদীর নাম কী ছিল?” বৃদ্ধ বললেন, “শঙ্খিনী।” তূর্য মানচিত্রের দিকে তাকাল। নদীর নাম সেখানে লেখা নেই। কিন্তু মানচিত্রের এক কোণে ছোট একটি চিহ্ন ছিল—একটি বৃত্তের ভেতরে তিনটি দাগ। রাফি বলল, “এই চিহ্নটা কী?” বৃদ্ধ চিহ্নটি দেখে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। “ওটা?” “হ্যাঁ।” বৃদ্ধ ধীরে বললেন, “ওটা ছিল নদীর পুরোনো জলমাপার ঘর।”

অধ্যায় ৩

তিনটি দাগ

জলমাপার ঘরটি কোথায় ছিল, তা কেউ ঠিক করে বলতে পারল না। বৃদ্ধ শুধু বললেন, নদীর পানি মাপার জন্য একসময় সেখানে একটি কাঠের খুঁটি বসানো হয়েছিল। রাফি মানচিত্রের চিহ্নটি আবার দেখল। তিনটি সমান্তরাল দাগ। তূর্য বলল, “এটা কি তিনটা পানির স্তর?” নীলয় বলল, “হয়তো।”

তারা জায়গাটি খুঁজতে শুরু করল। প্রায় এক ঘণ্টা পর কাশবনের ভেতর নীলয় একটি অদ্ভুত কাঠের অংশ দেখতে পেল। “এইদিকে আসো!” তিনজন ছুটে গেল। মাটির ভেতর অর্ধেক ডুবে থাকা একটি পুরোনো কাঠের খুঁটি। খুঁটির গায়ে তিনটি দাগ। রাফি মাটি পরিষ্কার করে খুঁটির নিচের অংশ দেখতে লাগল। সেখানে মরিচা ধরা একটি ধাতব প্লেট লাগানো। লেখা প্রায় মুছে গেছে। তবু কয়েকটি অক্ষর বোঝা গেল— “শঙ্খিনী জল পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র”

তূর্য উত্তেজিত হয়ে বলল, “আমরা পেয়ে গেছি!” রাফি বলল, “একটা খুঁটি পেয়েছি। রহস্যের উত্তর নয়।” সে চারপাশে তাকাল। খুঁটির পাশে মাটিতে কয়েকটি

অস্বাভাবিক গর্ত। নীলয় হাঁটু গেড়ে বসে বলল, “এগুলো দেখো।” গর্তগুলো একই সরল রেখায় রয়েছে। রাফি মাটিতে একটা লাঠি দিয়ে রেখাটি অনুসরণ করল। রেখাটি কাশবনের ভেতর দিয়ে গিয়ে একটি উঁচু জায়গা দিকে উঠেছে। সেখানে মাটির নিচে পাথরের মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। তারা মাটি সরিয়ে দেখল, সেটি একটি পুরোনো ইটের নালা। নালা শুকনো। কিন্তু নালার ভেতরে কালচে দাগ দেখা যাচ্ছে। নীলয় আঙুল দিয়ে দাগের ওপর হাত না দিয়ে কাছে গিয়ে দেখল। “এখানে কখনো পানি চলেছে।” রাফি বলল, “শুধু তাই নয়। মনে হচ্ছে পানি অনেক দিন আগে পর্যন্ত চলত।” তূর্য বলল, “তাহলে নদী কোথায় গেল?” রাফি উত্তর দিল না। সে মানচিত্রের দিকে তাকাল। তারপর নালার দিকে। দুটোর দিক এক নয়। কিছু একটা বদলে গেছে।

অধ্যায় ৪

মাটির নিচের পথ

পরদিন তারা আবার সেখানে গেল। সামিউল স্যার সঙ্গে একটি পুরোনো নদী গবেষণার বই নিয়ে এসেছিলেন। বইটিতে শঙ্খিনী নদীর নাম পাওয়া গেল। ১৯৬৫ সালের একটি প্রতিবেদনে লেখা— শঙ্খিনী নদী বর্ষাকালে দ্রুত পানি বহন করত। নদীর তীরবর্তী জমিতে বন্যা হলেও নদীটি আশপাশের জলাভূমিকে পানি দিত।

আরেকটি প্রতিবেদনে লেখা ছিল— “নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে জলপ্রবাহের একটি অংশ পূর্বদিকে সরে যাচ্ছে।” রাফি থমকে গেল। “গতিপথ পরিবর্তন?” স্যার বললেন, “নদী সবসময় একই জায়গা দিয়ে প্রবাহিত হয় না। পলি জমা, ভাঙন, বাঁধ, মানুষের তৈরি কাঠামো—অনেক কারণেই নদীর গতিপথ বদলাতে পারে।” তূর্য মানচিত্রের দিকে তাকাল। “তাহলে নদী হারায়নি?” স্যার বললেন, “হয়তো নদীর মূল স্রোত অন্যদিকে চলে গেছে।”

তারা পুরোনো মানচিত্র এবং বর্তমান মানচিত্র পাশাপাশি রাখল। রাফি লক্ষ্য করল, ১৯৭৮ সালের মানচিত্রে একটি ছোট খাল নদী থেকে বের হয়ে দক্ষিণ-

পূর্ব দিকে গেছে। বর্তমান মানচিত্রে সেই খাল নেই। কিন্তু তার জায়গায় আছে একটি রাস্তা। নীলয় বলল, “রাস্তা বানানোর সময় খালটা ভরাট করা হয়েছিল?” কাছের গ্রামের একজন বৃদ্ধ তা শুনে বললেন, “অনেক বছর আগে রাস্তা হয়েছে। তার আগে সেখানে বর্ষায় পানি থাকত।” রাফি এবার বুঝতে পারল, রহস্যটা হয়তো কোনো গুপ্তধনের নয়। এটি একটি হারিয়ে যাওয়া জলপথের গল্প। কিন্তু মানচিত্রের শেষ বাক্য? “তার শব্দ এখনও শোনা যায়।” শব্দটা কোথায়?

অধ্যায় ৫

রাতের শব্দ

সন্ধ্যার পর তারা গ্রামের একটি নিরাপদ বাড়িতে থাকল। রাত প্রায় দশটা। চারদিকে নীরবতা। হঠাৎ তূর্য বলল, “শুনতে পাচ্ছ?” সবাই চুপ করে গেল। খুব ক্ষীণ একটা শব্দ। ঝর... ঝর... ঝর... নীলয় উঠে দাঁড়াল। “পানির শব্দ?” তারা টর্চ নিয়ে বাইরে বের হলো। শব্দটা দূরের নিচু জমি থেকে আসছে। তিন বন্ধু ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। এক জায়গায় গিয়ে শব্দটা আরও স্পষ্ট হলো। কিন্তু আশেপাশে কোনো পানি নেই। রাফি মাটিতে কান না লাগিয়ে হাত দিয়ে মাটি ছুঁয়ে দেখল। মাটি ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে। সে বলল, “এখানে নিচে পানি থাকতে পারে।”

তূর্য বলল, “কিন্তু পানি যদি মাটির নিচে থাকে, শব্দ হচ্ছে কীভাবে?” নীলয় চারপাশে তাকিয়ে একটি সরু গর্ত দেখতে পেল। গর্তটি প্রায় মানুষের আঙুল ঢোকার মতো। সেখান থেকে বাতাস বের হচ্ছে। বাতাসের সঙ্গে পানির ক্ষীণ শব্দও শোনা যাচ্ছে। সামিউল স্যার বললেন, “মাটির নিচে ফাঁপা জায়গা বা পুরোনো নালা থাকলে এমন হতে পারে।” রাফি বলল, “মানে পুরোনো নদীর কোনো অংশ এখনও মাটির নিচে আছে?” স্যার

বললেন, “সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রমাণ দরকার।” তূর্য উত্তেজিত হয়ে বলল, “তাহলে কাল আমরা মাটির নিচে নদী খুঁজব!” স্যার হেসে বললেন, “মাটি খুঁড়ে নয়। আগে তথ্য দিয়ে।”

অধ্যায় ৬

পানির গোপন পথ

পরদিন তারা গ্রামের একটি গভীর নলকূপের পানি পরীক্ষা করল। তাদের কাছে একটি সাধারণ জলপরীক্ষার কিট ছিল। তারা বিভিন্ন জায়গার পানির নমুনা সংগ্রহ করল। নিচু জমি। পুরোনো নালা। নলকূপ। আর দূরের একটি পুকুর। রাফি সব নমুনার তাপমাত্রা ও কিছু রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নোট করল। সবচেয়ে অদ্ভুত ফল পাওয়া গেল নিচু জমির কাছে। সেখানে মাটির নিচের পানির তাপমাত্রা আশেপাশের পানির তুলনায় সামান্য আলাদা।

নীলয় বলল, “এটা কি প্রমাণ করে পানি নদী থেকে এসেছে?” স্যার বললেন, “না। শুধু এই তথ্য দিয়ে তা বলা যাবে না।” রাফি বলল, “তাহলে আমাদের আরও তথ্য দরকার।” তারা স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে জানতে পারল, বর্ষায় ওই নিচু জমির কয়েকটি জায়গা অন্য জায়গার তুলনায় আগে ভিজে যায়। একজন কৃষক বললেন, “বৃষ্টি থামার পরও ওই জায়গায় পানি থাকে।” রাফি সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্রে জায়গাগুলো চিহ্নিত করল। অদ্ভুতভাবে সবগুলো জায়গা একটি সরু রেখা তৈরি করেছে। রেখাটি পুরোনো নালার সঙ্গে মিলে যায়।

তারপর সেটি এগিয়ে গেছে রাস্তার নিচ দিয়ে। তূর্য বলল, “রাস্তার নিচে নালা আছে!” স্যামিউল স্যার বললেন, “হয়তো পুরোনো জলপথের কিছু অংশ এখনও আছে।” কিন্তু প্রশ্ন হলো— জলপথটি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?

অধ্যায় ৭

রাস্তার নিচে

তারা গ্রামের প্রবীণদের সাহায্যে পুরোনো রাস্তার ইতিহাস জানল। রাস্তা তৈরির সময় নাকি একটি ছোট সেতু ছিল। এখন সেখানে সেতু নেই। আছে একটি কালভার্ট। তিন বন্ধু কালভার্টটি দেখতে গেল। বর্ষা না থাকায় কালভার্টের নিচে প্রায় শুকনো। কিন্তু দেয়ালের এক পাশে সবুজ শ্যাওলা। রাফি বলল, "এখানে নিয়মিত পানি আসে।" নীলয় নিচু হয়ে দেখল, কালভার্টের ভেতরে কাদা জমে আছে। কাদার ওপর ছোট ছোট শুকনো শামুকের খোলস। তূর্য বলল, "এগুলো কি নদীর?" স্যার বললেন, "শুধু এগুলো দেখে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। তবে এখানে দীর্ঘদিন পানি থাকার সম্ভাবনা আছে।"

তারা কালভার্টের অন্য প্রান্তে গেল। সেখানে একটি সরু খাল। খালটি প্রায় শুকনো। কিন্তু তার দিক দেখে রাফি হঠাৎ চমকে উঠল। "এটা তো পুরোনো মানচিত্রের নদীর দিকে যাচ্ছে!" সবাই মানচিত্র বের করল। মিলছে। প্রায় একই রেখা। তাহলে শঙ্খিনী নদী পুরোপুরি হারায়নি। তার পুরোনো একটি শাখা এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু সেটি এত সরু হয়ে গেছে যে বর্ষা ছাড়া প্রায় দেখা যায় না। তূর্য বলল, "আমরা তাহলে নদী খুঁজে

পেয়েছি?” রাফি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, “নদীর একটা অংশ।” তারপর মানচিত্রের শেষ বাক্যটির কথা মনে পড়ল। “তার শব্দ এখনও শোনা যায়।” রাফি বলল, “আমাদের আসল উত্তর এখনও বাকি।”

অধ্যায় ৮

শেষ চিহ্ন

মানচিত্রটি তারা আবার শুরু থেকে দেখল। নদী। জলমাপের খুঁটি। পুরোনো নালা। তারপর তিনটি ছোট বৃত্ত। তূর্য বলল, “এই তিনটা বৃত্ত কী?” স্যামিউল স্যার বললেন, “হয়তো তিনটি পর্যবেক্ষণ পয়েন্ট।”

তারা তিনটি জায়গার অবস্থান বর্তমান মানচিত্রে বসাল। প্রথমটি—পুরোনো জলমাপের খুঁটি। দ্বিতীয়টি—কালভার্ট। তৃতীয়টি—একটি ছোট টিলা। তারা টিলাটির কাছে গেল। সেখানে একটি ভাঙা পাথরের ফলক পাওয়া গেল। ফলকে লেখা— “শঙ্খিনী প্রবাহ মাপ কেন্দ্র — ১৯৭৮” তার নিচে কয়েকটি সংখ্যা। তূর্য বলল, “এগুলো কী?” রাফি সংখ্যাগুলো দেখে বুঝতে পারল, এগুলো পানির উচ্চতার মাপ। আর শেষের সংখ্যাটি অন্যগুলোর চেয়ে বড়। সামিউল স্যার বললেন, “এটা সম্ভবত বড় বন্যার সময়ের পানির উচ্চতা।”

রাফি মানচিত্রের নদীর রেখা আর সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেখল। তারপর হঠাৎ বলল, “আমি বুঝেছি।” নীলয় তাকাল। “কী?” “ন নদী হারায়নি। নদীর স্রোত

ধীরে ধীরে বদলেছে। কিন্তু পুরোনো জলপথের কিছু অংশ মাটির নিচে ও কালভার্টের ভেতর এখনও আছে। ভারী বৃষ্টির সময় সেই পথ দিয়ে পানি আবার চলতে পারে।” তূর্য বলল, “আর সেই পানির শব্দই আমরা শুনেছি!” রাফি মাথা নাড়ল। “ঠিক।” কিন্তু এরপরও একটি প্রশ্ন ছিল। কে এই মানচিত্র বানিয়েছিল?

অধ্যায় ৯

চিঠির উত্তর

বিজ্ঞানকেন্দ্রে ফিরে তারা পুরোনো খাতাটি আবার খুলল। খাতার শেষ পাতাগুলো এতদিন ভালোভাবে দেখা হয়নি। শেষ পাতায় একটি ছোট চিঠি ছিল। চিঠিটি লেখা হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। লেখক ছিলেন স্থানীয় এক তরুণ শিক্ষক—আবদুল কাদের। চিঠিতে লেখা ছিল, তিনি ছাত্রদের নিয়ে শঙ্খিনী নদীর পানি ও গতিপথ পর্যবেক্ষণ করতেন।

তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, নদীর একটি অংশ ধীরে ধীরে পলি ও মানুষের তৈরি বাঁধের কারণে সংকুচিত হচ্ছে। তাই তিনি নদীর পুরোনো পথের মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। চিঠির শেষ অংশে লেখা— “নদীকে শুধু পানি হিসেবে দেখলে তার ইতিহাস বোঝা যায় না। নদী হলো পথ, মাটি, মানুষ ও সময়ের একসঙ্গে লেখা গল্প।” তিন বন্ধু চুপ করে পড়তে লাগল। তূর্য বলল, “তাহলে উনি জানতেন নদী একদিন বদলে যাবে?” স্যামিউল স্যার বললেন, “তিনি ভবিষ্যৎ জানতেন না। তিনি শুধু পরিবর্তনের লক্ষণগুলো লিখে রেখেছিলেন।” রাফি বলল, “মানে পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যৎ বুঝতে সাহায্য করতে পারে।” স্যার বললেন, “ঠিক তাই।” তিন বন্ধু আবার

মানচিত্রটি খুলল। এবার সেটি আর রহস্যের মানচিত্র মনে হলো না। এটি হয়ে উঠেছে একটি সতর্কবার্তা। একটি নদীর হারিয়ে যাওয়ার গল্প।

অধ্যায় ১০

নদীর নতুন পথ

তিন বন্ধু তাদের সব তথ্য নিয়ে বিজ্ঞানকেন্দ্রে একটি প্রদর্শনী তৈরি করল। এক পাশে ১৯৭৮ সালের মানচিত্র। অন্য পাশে বর্তমান মানচিত্র। মাঝখানে পুরোনো জলমাপের খুঁটির ছবি। আর নিচে লেখা—“নদী কোথায় গেল?” প্রদর্শনী দেখতে অনেক মানুষ এল। তারা দেখল, নদীর পুরোনো পথের কিছু অংশ এখনও বর্ষায় সক্রিয় হয়। স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষক ও পরিবেশকর্মীও বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ দেখালেন। তবে রাফি বারবার সবাইকে বলল, “আমরা কোনো সিদ্ধান্ত দিতে আসিনি। আমরা শুধু পুরোনো তথ্য আর বর্তমান পর্যবেক্ষণ একসঙ্গে দেখাচ্ছি।”

একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো। পরদিন সকালে তূর্য দৌড়ে বিজ্ঞানকেন্দ্রে এসে চিৎকার করে বলল, “রাফি! নীলয়! নদী এসেছে!” তিনজন ছুটে গেল। যে নিচু জমিটা কয়েক দিন আগে শুকনো ছিল, সেখানে এখন সরু স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পানি কালভার্টের নিচ দিয়ে যাচ্ছে। তারপর পুরোনো নালার দিকে। আর দূরে গিয়ে একটি বড় জলাভূমিতে মিশে যাচ্ছে। রাফি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নোটবুক বের করল। তারিখ লিখল।

সময় লিখল। বৃষ্টির পরিমাণ লিখল। পানির প্রবাহের দিক লিখল।

তূর্য বলল, “এত কিছু লিখছিস কেন?” রাফি হেসে বলল, “কারণ পঞ্চাশ বছর পর কেউ যদি এই জায়গায় এসে জানতে চায়—‘নদীটা কোথায় ছিল?’—তাহলে যেন তার হাতে উত্তর থাকে।” নীলয় বলল, “তাহলে আমরাও একটা মানচিত্র বানাব?” রাফি বলল, “শুধু মানচিত্র নয়। নদীর গল্পও লিখব।” তিন বন্ধু নদীর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সরু স্রোতটি তখন মাটির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। শব্দ হচ্ছে— ঝর... ঝর... ঝর... তূর্য মৃদু হেসে বলল, “এটাই তাহলে সেই শব্দ।” রাফি বলল, “হ্যাঁ। হারিয়ে যাওয়া নদীর শব্দ।”

উপসংহার

গল্প থেকে যা শিখলাম

১. পুরোনো তথ্যের মূল্য আছে: পুরোনো মানচিত্র, নথি ও মানুষের স্মৃতি বর্তমানের কোনো ঘটনা বোঝার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে।

২. প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করো: পানি কোথায় জমে, কোথা দিয়ে প্রবাহিত হয়, কোথায় মাটি বেশি স্যাঁতসেঁতে—এ ধরনের ছোট সংকেত বড় পরিবর্তনের তথ্য দিতে পারে।

৩. একটি প্রমাণই যথেষ্ট নয়: একটি তথ্য দেখে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিভিন্ন উৎসের তথ্য মিলিয়ে দেখা দরকার।

৪. মানুষের কাজ প্রকৃতিকে বদলে দিতে পারে: রাস্তা, বাঁধ, খাল ভরাট কিংবা অন্য নির্মাণকাজ নদী ও পানির স্বাভাবিক পথ পরিবর্তন করতে পারে।

৫. আজকের পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতের ইতিহাস: আমরা আজ যা লিখে রাখি, ছবি তুলি ও মাপ নিই—ভবিষ্যতে অন্য কেউ সেটিকে ব্যবহার করে অতীতকে বুঝতে পারে।

* তিন বন্ধু সিরিজ (বই ৩): "হারিয়ে যাওয়া নদীর মানচিত্র" | পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)